

এক
মহাপুরুষের
বিপ্লবী
আওয়াজ

নীতির পরিবর্তন চিহ্ন



গাজী আতাউর রহমান

এক মহাপুরুষের বিপ্লবী আওয়াজ
নীতির পরিবর্তন চাই



এস্থানায়
গাজী আতাউর রহমান



ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

নীতির পরিবর্তন চাই

মাওলানা গাজী আতাউর রহমান

প্রকাশনায় :

পরিচালক

আই. এস. সি. এ পাবলিকেশন্স

৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা)

ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৬৭১৩০

ওয়েব সাইট : www.iscabd.org

স্বত্ব

আই. এস. সি. এ পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল :

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৯

পরিমার্জিত ষষ্ঠ প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৮

পঞ্চদশ প্রকাশ : জুলাই ২০১৪

ষোড়শ প্রকাশ : জুলাই ২০১৬

নির্ধারিত মূল্য : ১২ টাকা মাত্র

NEETIR PARIBARTAN CHAI

by Gazi Ataur Rahman

Published by I.S.C.A Publications

55/b Purana Paltan, Dhaka- 1000

Fixed Price - Taka 12.00 Only

লেখকের কথা

“এক মহাপুরুষের বিপ্লবী আওয়াজঃ শুধু নেতা নয় নীতির পরিবর্তন চাই, এটি মরহুম শায়েখ সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম রহ.- এর উপর আমার একটি মূল্যায়নধর্মী রচনা। এখানে তাঁর সুবিশাল কর্মময় জীবন বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি বরং তাঁর সমাজবিপ্লবের মৌল চেতনাটুকুই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল হযরত পীর সাহেব রহ.- এর ইন্তেকালের ৭ বছর পূর্বে ১৯৯৯ সালে। যেহেতু মহান রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সমাজবিপ্লবের বলিষ্ঠ চেতনায় এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি বরং আরও শাণিত হয়েছে তাই দৃঢ়তার সাথে মনে করি, আমার এই ক্ষুদ্র রচনার বিষয়বস্তু শতভাগ যথার্থ। যে কারণে হযরতের রহ.- ইন্তেকালের পরেও আমি বইটির কোথাও কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করিনি। প্রাসঙ্গিক কারণে এবং প্রকাশকের অনুরোধে কিছু কিছু জায়গায় বিষয়বস্তু ঠিক রেখে শব্দের পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র। সত্যিকথা বলতে কি, ক্ষুদ্র এই বইটি প্রকাশের পর ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, সমর্থকদের মাঝে এতটাই যে সমাদৃত হবে, তা ভাবিনি।

মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি এ জন্য যে, এই ক্ষুদ্র রচনাটির প্রয়াস পাঠক হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করতে পারছে এবং এতে সাড়া দিয়ে অনেকেই দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। পরিশেষে মোবারকবাদ জানাই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের নিষ্ঠাবান স্নেহাস্পদ দায়িত্বশীলদেরকে যারা এই বইটি চাহিদার আলোকে প্রায় প্রতি বছরই পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রকাশ করছে এবং অত্যন্ত সুলভ মূল্যে সারাদেশে পরিবেশন করছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সকলকে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

-গাজী আতাউর রহমান

প্রাসঙ্গিক কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবী আদর্শ। আর একজন আদর্শ বিপ্লবী নেতা ছাড়া একটি সফল বিপ্লবের চিন্তা করা যায় না। আপসহীন বিপ্লবী মহাপুরুষের তেজোদ্বীপ্ত ঈমানী বলে যুগে যুগে বিভিন্ন ভূখণ্ডে ইসলাম পূর্ণতা পেয়েছে।

অতএব ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে দু'টো বিষয় পরিষ্কার।

১. কোন ভূখণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি সফল বিপ্লব প্রয়োজন।

২. একটি সফল বিপ্লবের জন্য একজন আদর্শ বিপ্লবী নেতা প্রয়োজন।

আমাদের এ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অধিকাংশ মানুষই ইসলাম চায়। ইসলাম ভালবাসে না, এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। যারা ইসলাম চায় না, তারাও প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করার সাহস সহজে পায় না। তারপরও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমাজের সর্বত্রই আজ ইসলামী আদর্শ পরাজিত। বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার।

কিন্তু প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করলে এ অবস্থাকে মোটেও অস্বাভাবিক বলা যাবে না। কারণ এ ভূখণ্ডে কখনো সফল ইসলামী বিপ্লব হয়নি। কোন আদর্শ বিপ্লবী নেতা জাতিকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারেননি। ইসলামের খেদমত হয়েছে অনেক। বহু পন্থা ও প্রক্রিয়ায় দীনের মেহ্নত হয়েছে। ইসলামী বিপ্লবের ধারা এখনো বিরাজমান। কতভাবে যে দীনের খেদমত হচ্ছে, তা হিসাব করে শেষ করা যাবে না।

সঠিক ধারায় শত বছর ধরে দীন ইসলামের সুমহান খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে এমন উল্লেখযোগ্য মিশন হল— মাদ্রাসাভিত্তিক ইলমে

ইশায়াতে দীনের খেদমত, রাজনীতির মাধ্যমে সিয়াসাতে দীনের খেদমত, লেখকদের মাধ্যমে তাসনীফাতের খেদমত ইত্যাদি। উল্লিখিত হকপস্থি খেদমতগার মিশনগুলো এ দেশে দীনের জন্যে অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

শত বছর ধরে অব্যাহত চতুর্মুখী এসব খেদমতের স্বাভাবিক দাবি ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশে ইসলামী আদর্শ বিজয়ী হওয়া। কিন্তু তা কি হয়েছে? হয়নি। বরং ইসলামী আদর্শের ক্রমাবনতি ঘটছে। সর্বত্র জাহিলিয়াতের জয় জয়কার। সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, একথা কোনক্রমেই বলা যাবে না। বরং ইসলামবিরোধী ও ইসলামবিমুখী চিত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমবর্ধমান হারে।

তবে মাদ্রাসা, তাবলীগ, তরীকা, ওয়াজ-নসিহত, ইসলামী রাজনীতি ও লেখালেখির খেদমতের মাধ্যমে ইসলামের কোন উপকারই যে হচ্ছে না, একথা বলার স্পর্ধা কারো নেই। বরং একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, এসব নির্ভেজাল খেদমতের বদৌলতে ইসলামের অনেক-অনেক উপকার হচ্ছে। এমনকি ব্যক্তি ও সমাজে এখনো যতটুকু ইসলামী আদর্শ বিরাজমান, তা এসব খেদমতেরই স্বার্থক প্রতিফলন।

কিন্তু আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন তো শুধু এতটুকু খেদমত করার জন্যেই ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে পাঠাননি। আল্লাহ দীন ইসলাম পাঠিয়েছেন একে অন্যান্য আদর্শের ওপর বিজয়ী করার জন্যে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্'র ঘোষণা হল—

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔

অর্থ : তিনিই সে সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে স. সঠিক পথ ও দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি এই দীনকে অপরাপর ভ্রান্ত দীনের ওপর বিজয়ী করেন। (তওবা, ৩৩, ফাতাহ- ২৮, সাফ-৯)

রাসূলকে স. যে দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন, রাসূলের স. অবর্তমানে সে দায়িত্ব এখন গোটা উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর বর্তিয়েছে। অতএব দীন ইসলামকে অপরাপর মতবাদের ওপর বিজয়ী করা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত অনাদর্শ পরিবর্তন করে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের অপরিহার্য দায়িত্ব। কোন অজুহাতেই কোন মুসলমান এ মৌলিক দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

কিন্তু সমস্যা হল, দীন ইসলাম যে পরাজিত এবং একে যে বিজয়ী করতে হবে— এই বাস্তব অনুভূতিটুকু অনেক বিজ্ঞজনের মাঝেও অনুপস্থিত। প্রায় অধিকাংশ দীনদার মহলের ধারণা হল— ‘আমরা তো কোন না কোনভাবে দীনের খেদমত করেই যাচ্ছি। নিজেরাও পুরো দীনের ওপর চলার চেষ্টা করছি। অতএব বাড়তি কোন ঝামেলায় জড়ানোর প্রয়োজনটা কী?’

আবার আরেকটু বুদ্ধিমান(!) শ্রেণি চালাকি করে এরূপ ব্যাখ্যা দেন— ‘ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে সবাইকেই যে জিহাদ করতে হবে, বিপ্লবী হতে হবে, এটা কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। বরং কিছু লোক জিহাদের ময়দানে দায়িত্ব পালন করলেই তো দায়মুক্ত হওয়া যায়। সকলেই ইসলামী আন্দোলনে নেমে পড়লে তো দীনের অন্যান্য মহৎ খেদমতের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।’

এসব ব্যাখ্যা যারা প্রদান করেন, তাদের অধিকাংশই পুরোপুরি হকপন্থী। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ইসলামী মিশনে এ জাতীয় বুয়ুর্গগণের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। অতএব তাঁদের এই সরল ব্যাখ্যায় স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গনের অধিকাংশ মেধাবী ছাত্র এবং সমাজের ইসলামী ভাবাপন্ন বৃহৎ অংশ। ফলে ইসলামের খেদমতের জন্যে এরা বেছে নেয় অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা। এ জন্যেই দেখা যায় মাদ্রাসা থেকে যে ছাত্রটি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বের হলেন, তিনি ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে আসেন না। সমাজ পরিবর্তনের তাগিদে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। বরং তিনি তার মুরব্বীদের সীমাবদ্ধ ছকের সরল চেতনা অনুসরণ করে শিক্ষকতার পেশাকেই জীবনের এক নাম্বার ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন।

আবার অন্যদিকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা অপরাপর আধুনিক শিক্ষাঙ্গনের ইসলামপ্রিয় মেধাবী ছাত্ররাও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে অনীহা বোধ করেন। যারা ইসলামের প্রতি একটু দুর্বল, তাদের মাঝেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যে একটি পূর্ণাঙ্গ দীন কাজ, এমন মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে।

অবশ্য অনেকে সরল ধারণা নিয়ে তাবলীগ জামাআতের সাথে জড়িত হচ্ছেন, ফলে সঠিক ধারার ইসলামী আন্দোলনে সৃষ্টি হচ্ছে নেতৃত্বের দৈন্যতা। যার পরিণতিতে ইসলামী আদর্শকে অনাদর্শের ওপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার অপরিহার্য দাবিটি যথাযথ গতি পাচ্ছে না।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে হয়তো একটি মারাত্মক অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে। তা হলো— তা‘লীমে দীন, তাবলীগে দীন, তরীকুতে দীন ও ইশায়াতে দীন কি ইক্বামাতে দীনের জন্যে সহায়ক নয়?

এই যৌক্তিক প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হলো— এই খেদমতগুলো ইক্বামাতে দীনের একান্ত সহায়ক শক্তিই শুধু নয়, বরং এগুলো হল ইক্বামাতে দীন ও ইজহারে দীনের জন্যে অপরিহার্য পূর্বশর্ত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে বিষয়টির একটু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নয়তো আরো একটি জটিল প্রশ্ন অতি স্বাভাবিকভাবেই উত্থাপিত হবে যে, শত বছর ধরে দীনের এতগুলো সঠিক ধারার খেদমতগার মিশনের অব্যাহত প্রয়াস সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে দীনি আদর্শ কেন বিজয়ী হয়নি?

দীনকে বিজয়ী করার চূড়ান্ত ইচ্ছা ও ক্ষমতা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলার হাতে। কিন্তু বাহ্যিক বিপর্যয়ের কারণ চিহ্নিত করা এবং গঠনমূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণের দায়িত্ব নিশ্চয়ই বান্দার। অতএব একযোগে দীনের এত এত খেদমত শত বছর ধরে এ ভূখণ্ডে বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও কেন দেশের একটি অফিসেও ঘুষ বন্ধ হয়নি? একটি আদালতেও কেন মিথ্যা সাক্ষী ও বিচারের প্রহসন বন্ধ হয়নি? রাষ্ট্রের একটি ব্যাংকেও কেন সুদ বন্ধ হয়নি?

সমাজের একটি গ্রামেও কেন পর্দা চালু হয়নি? একটি মহল্লায়ও কেন ব্যভিচারের প্রকাশ্য মহড়া বন্ধ হয়নি? একটি মদের দোকানও কেন কমেনি? প্রশাসনের কোন একটি ডিপার্টমেন্টও কেন দুর্নীতিমুক্ত হয়নি? অশান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেন শান্ত হয়নি? ক্ষুধার্ত অন্নহীনের সংখ্যা কেন কমেনি? নাঙ্গা বদন বস্ত্রহীন আদম সন্তানের সংখ্যা কেন বাড়ছে? আশ্রয়হীনের বাসস্থানের সংকট কেন এত প্রকট হচ্ছে? সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা কেন এত দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে? দিন দিন বাড়ছে কেন খুন-খারাবি ও অস্বাভাবিক মৃত্যু?

দেশের একটি অঞ্চলেও কেন শরীয়তের আহুকাম প্রতিষ্ঠা করা যায়নি? একটি গ্রামেও কেন যথাযথভাবে নামাজ কায়েম হয়নি? একটি শহরেও কেন যাকাত আদায় হয় না? দুর্নীতির রাস্তাঘাস না পেরিয়ে কেন হাজীগণ আল্লাহর ঘরও তাওয়াফ করতে পারেন না? জিনার আহুকাম শোনাতে কেন জেলে যেতে হয়, পুলিশী নির্যাতনের শিকার হতে হয়? চোরের হাত কাটার চিন্তাও কেন করা যায় না? পর্দার কথা বললে কেন উপহাসের পাত্র হতে হয়? সামগ্রিক জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বললে কেন নিগৃহীত হতে হয়? এক কথায় সমাজ ও রাষ্ট্রের কোথাও কেন আল্লাহর বিধান কায়েম হয়নি এবং একটি জাহেলী ব্যবস্থারও কেন অবসান ঘটেনি?

এসব জটিল প্রশ্নের উত্তর তেমন একটা কঠিন নয়। উত্তর সহজ। সকল খেদমতই যথাস্থানে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার সাথে হয়েছে এবং হয়তো যথার্থও হয়েছে। কিন্তু সকল খেদমতের সমন্বয়ে যে বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি। অতএব সামগ্রিক ক্ষেত্রে দীন ইসলামও বিজয়ী হয়নি।

খেদমত হয়েছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। মেহ্নত হয়েছে ব্যক্তির পেছনে। বিপ্লবও হয়েছে ব্যক্তির মাঝে। অতএব এর ফল স্বরূপ অনেকে পরিশুদ্ধ হয়েছে। দীনের অনুস্মৃতিও ঘটেছে অনেকের মাঝে। অসংখ্য অগণিত ব্যক্তি জীবনে দীন আখলাক বিজয়ী হয়েছে। এই পরিশুদ্ধ ব্যক্তি সমষ্টির সমন্বয়ে সামগ্রিক জীবনে দীন বিজয়ী করার জন্যে একটি সর্বাঙ্গিক বিপ্লবের সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে বহু আগেই। কিন্তু এ সম্ভাবনাকে যথার্থভাবে এখনো কাজে লাগানো যায়নি।

যেহেতু সমাজে বিপ্লব হয়নি, তাই সমাজ থেকে জাহিলিয়াত দূর হয়নি। সমাজও পরিশুদ্ধ হয়নি। আর রাষ্ট্রেও যেহেতু বিপ্লব হয়নি, তাই রাষ্ট্রীয় জীবনে জাহিলিয়াত দূর হয়নি। রাষ্ট্রও পরিশুদ্ধ হয়নি। এককথায় সামগ্রিক জীবনে দীন বিজয়ী হয়নি।

এখানে অবশ্য একটি প্রশ্ন জাগতে পারে, ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হলেই তো সমাজ ও রাষ্ট্র ঠিক হয়ে যাবে। অতএব ব্যক্তির পেছনে মেহ্নত করাই কি যথেষ্ট নয়? সমাজ ও রাষ্ট্রে একটি বিপ্লব সাধনের কঠিন ও

চিন্তার আবার কী প্রয়োজন? অবশ্য এ প্রশ্নটা সচেতন বিবেকবানদের মনে জাগা উচিত নয়। কারণ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তির পেছনে মেহ্নত করা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে পরিশুদ্ধির মিশন, চাই তা পীর-মুরীদী তরীকায় হোক, দাওয়াতে তাবলীগের মাধ্যমে হোক, ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে হোক কিংবা মাদ্রাসা-মসজিদ কেন্দ্রিক হোক, অত্যন্ত উত্তম ও প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু দীন ইসলামের পূর্ণ হক আদায়ের ক্ষেত্রে শুধু এ কাজগুলোকেই যথেষ্ট ভাবা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি কিছুতেই পরিশুদ্ধ হয় না। তা সম্ভবও নয়। রাসূলকে স. উদ্দেশ্য করে মহান রাব্বুল আলামীনের ঘোষণাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যথা—

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمْ نُذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

অর্থ : আপনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাদের জন্য সমান, তারা কখনও ঈমান আনয়ন করবে না। (সূরা বাকারা, আয়াত : ৬)

মহানবীর তেইশ বছরের নবুয়তী জিন্দেগী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে মেহ্নত করেই সমাজ ও রাষ্ট্র পরিশুদ্ধ করতে পারেননি। এমনকি মক্কার তের বছরের নবুয়তী জিন্দেগীর দাওয়াতী মিশনে খুব কমসংখ্যক লোকই দীন গ্রহণ করেছিলেন। অথচ মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পর মাত্র অল্প দিনের ব্যবধানেই দশ হাজার সাহাবী নিয়ে মক্কা বিজয় করেছিলেন। আর মক্কা বিজয়ের পর মুশরিক ও পৌত্তলিকদের কাছে রাসূলকে স. দীনের দাওয়াত নিয়ে যেতে হয়নি। বরং সকলে স্বেচ্ছায়ই দলে দলে দীনের পথে এসেছিলেন। শুধু রাসূলের স. যুগেই নয়, বরং খোলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত বিপ্লব ও সর্বাঙ্গিক জিহাদ ছাড়া কোন ভূখণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং দীন যথার্থভাবে বিজয়ী হয়েছে—এমন কোন বাস্তব নজির নেই।

অতএব শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে মেহ্নত করলেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী দীন ইসলামকে অন্যান্য আদর্শের ওপর বিজয়ী করার হক আদায় হবে, এ চিন্তা কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ, সঠিক ও বাস্তবসম্মত হতে পারে না। দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে যুগে যুগে

মহাপুরুষগণ এ জন্যেই সর্বাত্মক জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন।
দিয়েছেন বিপ্লবের আওয়াজ।

দীনকে বিজয়ী করার জন্যে এবং সামগ্রিক জীবনে ইসলামী আদর্শ
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আরেক মহাপুরুষও বিপ্লবী
আওয়াজ দিয়েছেন। সচেতন একজন দীনদার হিসেবে আমাদের
জানা উচিত কী সেই বিপ্লবী আওয়াজ? বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর
যথার্থতা কতটুকু? কে এই মহাপুরুষ এবং কী চান তিনি? সবশেষে
এই বিপ্লবী আওয়াজের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে জীবনের
সামগ্রিক ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়নে আমরা সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত হতে
পারব কিনা, তাও ভেবে দেখা উচিত।

বিপ্লবী আওয়াজ

দীন প্রতিষ্ঠার আওয়াজ প্রত্যেক যুগেই কম বেশি ছিল। পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের আলোকে মূল পরিধি ও ধরন অনুযায়ী যুগে যুগে বিপ্লবের পরিধিও একেক রকম ছিল। যেমন— রাসূলুলাহ (স.) বিপ্লব সাধন করেছেন জাহেলী যুগের প্রত্যেকটা ব্যক্তির মাঝে। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝেই ছিল জাহালাত, শিরক আর অজ্ঞতার কালো আঁধার। তিনি বিপ্লব করেছেন সমাজের প্রতিটি পরতে পরতে, কারণ গোটা সমাজই ছিল মানবসভ্যতার অনুপযোগী। তিনি বিপ্লব করেছেন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠিত শক্তির বিরুদ্ধে, কারণ সবই ছিল খোদাদ্রোহী। এক কথায় ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহানবী (স.) বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ও বিধান তথা দীনে হককে সর্বত্র বিজয়ী করেছেন।

রাসূলে কারীম (স.)-এর বিপ্লবের পরিধি ছিল ব্যাপক। তাওহীদের বিশ্বাস থেকে নিয়ে ইস্তেঞ্জার ঢিলা-কুলুখ পর্যন্ত সব কিছুই তাঁকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। মূর্তি ভাঙতে হয়েছে, মসজিদও গড়তে হয়েছে। যুদ্ধও করতে হয়েছে, সামাজিক নিরাপত্তাও প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। মারতেও হয়েছে, মার খেতেও হয়েছে। চুক্তিও করতে হয়েছে, আবার জিহাদের ঘোষণাও দিতে হয়েছে। তিনি মুবািল্লিগও ছিলেন। তিনি নামাজের ইমামতিও করেছেন, সদকাও দিয়েছেন। অর্থাৎ মহানবীর ২৩ বছরের নবুয়তী জিন্দেগীই হল ইসলামী বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত পরিধি।

অতএব মহানবী স. প্রতিষ্ঠিত জীবনাদর্শের ওপর আর কিছু বাড়ানোর যেমন সুযোগ নেই, তেমনি কোথাও তাঁর কোন আদর্শ উপেক্ষা করে পূর্ণাঙ্গ দীন প্রতিষ্ঠারও কোন পথ নেই। তাই আল্লাহর নির্দেশিত এবং

মহানবীর স. প্রতিষ্ঠিত আদর্শ যেখানে যে পরিমাণ উপেক্ষিত, সেখানে সে পরিমাণ বিপ্লব সাধনই হল ঈমানের দাবি।

এ দাবি পূরণের লক্ষ্যেই যুগে যুগে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিপ্লবী আওয়াজ উচ্চারিত হয়েছে। যেমন— প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রা.-এর যুগে কিছু লোক যাকাতের বিধান উপেক্ষা করেছিল, তখন তিনি বিপ্লবী আওয়াজ দিয়েছিলেন—

اَيُّنْقُصُ الدِّينُ وَاَنَا حَيٌّ -

‘আমি জীবিত থাকতে দীন অপূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে?’

হযরত আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে দীনের সকল বিধান প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু শুধু কিছু লোক যাকাত দানে অস্বীকার করাতে তিনি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। তিনি বলেছেন— আমি বেঁচে থাকতে দীন অপূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে, তা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। এমনিভাবে দীনের আরেকটি বিধান খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে যখন কেউ কেউ নবী দাবি করল, তখনো হযরত আবু বকর রা. তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। ভণ্ডদেরকে দমন করে তিনি খতমে নবুয়তকে হেফাজত করলেন।

মহানবীর স.-এর পর হযরত আবু বকর সিদ্দীকই রা. হলেন আমাদের জন্যে প্রথম অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীককেও রা. দীনের পূর্ণাঙ্গতা প্রতিষ্ঠার জন্যে বিপ্লব করতে হয়েছে। দীনে হকের বিন্দুমাত্র অপূর্ণতা তিনি বরদাশ্ত করেননি। তেমনি বরদাশ্ত করেননি মহানবীর স.-এর কোন বিপ্লবী সাহাবা (রা.)।

এমনিভাবে প্রত্যেক যুগের মহাপুরুষগণ দীনের অপূর্ণতা বরদাশ্ত করতে না পেরে বিপ্লবী আওয়াজ উচ্চারণ করেছেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের যুগে রুখে দাঁড়িয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. খলীফা মনসুরের শাসনামলে বিদ্রোহ করেছেন ইমাম আবু হানিফা রহ.। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. বিপ্লবী আওয়াজ উচ্চারণ করেছেন শাসক মু‘তাসিম বিন্মাহর যুগে। শাহ আলজুতীর অনাদর্শের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা করেছেন দর্শন শাস্ত্রের প্রবাদ পুরুষ ইমাম গাযযালী রহ. তাতারীদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করেছেন আল্লামা ইবনে

তাইমিয়া রহ.। বাদশাহ্ আকবরের দীনে এলাহীর বিরুদ্ধে বিপব করেছেন শায়খ আহমদ মুজাদ্দের আলফেসানী রহ.। এমনিভাবে হয়রত শাহ্ ওয়ালীউলাহ্ রহ. তৎকালীন মোগল শাসনামলের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দুরবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিপ্লবী আওয়াজ ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন—

فَكُّ كُلِّ نِظَامٍ

অর্থ : সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো।

শাহ্ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. দীনের চরম শত্রু ইংরেজ বেনিয়াদেরকে ভারত উপমহাদেশ থেকে বিতাড়নের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ জিহাদের ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে ভারত উপমহাদেশকে দারুণ হরব্ তথা ‘শত্রু কবলিত ভূখণ্ড’ ঘোষণা করেছিলেন। আর সৈয়দ আহমদ শহীদ রহ. ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রত্যক্ষ জিহাদের। তাঁদের বিপ্লবী আস্থানে সাড়া দিয়েছিলেন ভারত উপমহাদেশের লাখো মুসলমান। শাহাদাত বরণ করেছেন হাজারো উলামায়ে কেরাম।

জিহাদের ময়দানেই শহীদ হয়েছেন বিপ্লবী নেতা সৈয়দ আহমদ বেরলভী রহ.। দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন শাহ্ ইসমাঈল রহ., ফতেহ আলী সুলতান টিপু আর তিতুমীরের মত মর্দে মুজাহিদগণ। চরম নির্যাতিত হয়েছেন হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী, আল্লামা কাসেম নানুতবী, শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, আল্লামা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী, আল্লামা জাফর থানেশ্বরী, মাওলানা বেলায়েত আলী প্রমুখ উলামায়ে কেরাম।

উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবে ভারতীয় উলামায়ে কেরাম পুরোপুরি সফল হতে পারেননি ঠিক, কিন্তু সেই বিপ্লবের ধাক্কাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজ বেনিয়ারা ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। মহান বিপ্লবী নেতা সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ভারত উপমহাদেশে দীন ইসলামকে বিজয়ী করতে পুরোপুরি সফল হতে পারেননি ঠিক, কিন্তু তিনি বালাকোট প্রান্তরে নিজের বিপ্লবী খুন ঢেলে দিয়ে বিপ্লবের যে রক্তপিচ্ছিল পথ দেখিয়ে গেছেন, এ উপমহাদেশের নব্য বিপ্লবীদের শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত

সে পথের সন্ধান করে। উপমহাদেশ জুড়ে আজ বিপ্লবের যে মহড়া চলছে, তাতেও বালাকোটের জিহাদ নিঃসন্দেহে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করছে। বিপ্লবী উলামায়ে কেরাম সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদেরকে এ দেশ থেকে তাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। বিপ্লবের প্রাথমিক সফলতাও অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু বেশ কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে উপমহাদেশের মুসলমানরা বিপ্লবের চূড়ান্ত সুফল হিসেবে ইসলামকে বিজয়ী দেখতে পারেনি।

অথচ ভারতের দাবি আর পাকিস্তান সৃষ্টি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী উলামাদের মাঝে ইজতিহাদী মতপার্থক্য, পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিশ্বাসঘাতকতা, বাংলাদেশী উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তহীনতা ও সময়োপযোগী সাহসী ভূমিকার অভাবে এ ভূখণ্ডেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি।

সর্বশেষ প্রতিকূল পরিবেশের আবর্তে এ দেশের উলামায়ে কেরাম যখন হাত পা গুটিয়ে ঘরকুণো হয়ে গিয়েছিলেন, দীন ইসলামকে বিজয়ী করার গর্বিত স্বপ্নটিও যখন দীনের রাহ্‌বারদের দেমাগ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছিল, রাষ্ট্রের শাসকরা যখন একের পর এক গাদ্দারী আর ওয়াদা খেলাফীর মাধ্যমে গোটা জাতিকে চরম জাহিলিয়াতের পথে দ্রুত ধাবিত করছিল, ঠিক তখনই যুগ পরিক্রমায় আবারো সেই বিপ্লবী আওয়াজ উচ্চারিত হল। এবার বিপ্লবী আওয়াজ ঘোষণা করলেন নবতিপরা খুনখুনে বুড়ো হযরত মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ.।

এ বুড়ো নেতার বিপ্লবের গুরুটা ছিল বড়ই বিচিত্র। তিনি জাতীয়ভাবে তওবার আওয়াজ উচ্চারণ করলেন। নিজেও তওবা করলেন এবং উলামা-মাশায়েখসহ গোটা জাতিকে তওবার আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, ‘আমরা শাসক ও শাসিত উভয়ই পাপী। শাসকরা করেছেন ওয়াদাভঙ্গ ও প্রতারণার পাপ। শাসিতরা করেছে ওয়াদাভঙ্গকারী ও প্রতারণাদের ভোট দেওয়ার পাপ। তাই রক্ষা পেতে হলে সবাইকেই তওবা করতে হবে।’

শুরু হল বিপ্লবের এক নতুন অধ্যায়। আবারো জেগে উঠলেন দেশের উলামায়ে কেরাম। তওবার এক দুর্দমনীয় প্রেরণায় গা ঝারা দিয়ে উঠলেন আত্মসচেতন ওয়ারাসাতুল আশিয়াগণ। তওবার ডাকে

পড়ল ইসলামপ্রিয় জনতা। দেশপ্রেমিক জনতা পবিত্র এক আওয়াজে বিমুগ্ধ হয়ে উঠল। পিলে চমকে গেল খোদাদ্রোহীদের। হতচকিয়ে উঠল মুনাফিক আর গাদ্দার শ্রেণি। শত ষড়যন্ত্র আর অপপ্রচার সত্ত্বেও জাতির বিশাল অংশ তওবার সুযোগ গ্রহণ করল। গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়ে হযরত হাফেজ্জী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম সুযোগেই তৃতীয় স্থানে।

দল, কর্মী, অর্থ শক্তি ছাড়া একজন নবীন রাজনীতিক ঝানু ঝানু নেতাদেরকে ডিঙ্গিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তৃতীয় স্থান লাভ করে ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। নির্বাচনের ফলাফলের ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক পরাজয়কে মেনে নিয়ে হযরত হাফেজ্জী হুজুর ঘোষণা দিলেন “আমরা কামিয়াব। তওবার মাধ্যমে আমরা অতীতের ভুল-ত্রুটির পাপ মোচনের সুযোগ পেয়েছি।” তিনি এবার দৃষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করলেন— ‘দুর্ভাগ্যবশত এবার যারা তওবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি আমি তাদেরকে সুযোগদানের ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই।’

তিনি ঘোষণা করলেন ‘ইবলিসী খেলাফত উৎখাত করে আল্লাহর খেলাফত কায়েমের জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়। এ জিহাদে আমি শহীদ হলে আমার লাশ নিয়ে তোমরা এগিয়ে যেও।’ শুরু হল বিপ্লবী নেতার সংগ্রামের দ্বিতীয় অধ্যায়। এ সংগ্রাম তিনি শেষ করতে পারলেন না। একটি বিপ্লবের স্বপ্নকে বুকে নিয়েই এই মহান নেতার জীবনাবসান ঘটল। যদিও হযরত হাফেজ্জী হুজুর বিপ্লবকে সফলতার চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছাতে পারেননি, তবু তার আন্দোলনকে কিছুতেই ব্যর্থ বলা যাবে না। কারণ তিনি শুরু করেছিলেন, যার শেষ এখনো হয়নি। এখনো অব্যাহত আছে। তাঁর বিপ্লবী আওয়াজের ধরণ অপরিস্রবভাবে পরিবর্তিত হলেও সময়ের ব্যবধানে তা শাণিত হয়েছে বহুগুণে। যেসব দুর্বলতার কারণে হযরত হাফেজ্জী হুজুরের বিপ্লব সম্ভাব্য সময়ে সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে, সেসব কারণ ক্রমেই দূরীভূত হচ্ছে নতুন ধারার কৌশলী নেতৃত্বে।

শেষ মুহূর্তে এসে হাফেজ্জী হুজুরের আন্দোলনের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ছিল— খেলাফত কর্মীদের মাঝে মানসিক বিপ্লবের দৈন্যতা।

ধুমকেতুর মত হঠাৎ করে বিপ্লবের কঠিন ময়দানে নেমে আসাতে হযরত হাফেজ্জী হুজুর তাঁর বিশাল মিশনের সহযাত্রীদেরকে বিপ্লবের সঠিক মেজাজে তৈরি করার সুযোগ পাননি। ফলে খেলাফত কর্মীদের বৃহদাংশের মাঝে মানসিক বিপ্লবের কল্পনাই করা যায় না। তাইতো সামান্য প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই হাফেজ্জী হুজুরের আন্দোলন হঠাৎ করে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। অথচ সঠিক বৈপ্লবিক চেতনা নেতা-কর্মীদের মনোজগতে প্রবেশ করলে অত সহজে বিমিয়ে পড়ার কথা নয়। কারণ একবার যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে, সে পিছু হটতে পারে না কিছুতেই। নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না কোন অবস্থাতেই। বিপ্লবীরা কখনো পরিস্থিতির শিকার হয়ে অজুহাত খোঁজে না। বরং অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে বার বার চেষ্টা চালায়। হযরত হাফেজ্জী হুজুর কিন্তু যথার্থ বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্ভুদ্ধ হয়েই মাঠে নেমেছিলেন। এ জন্যেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, ‘এ আন্দোলন করতে গিয়ে আমি যদি মরেও যাই, আমার লাশ নিয়ে তোমরা আগে বাড়বে।’

হযরতের মনোজগতে যথার্থ বিপ্লব ঘটেছিল। তাই তিনি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। পরিস্থিতির শিকার হয়ে তিনি খানকায় ফিরে যাননি। বরং পরিস্থিতি পরিবর্তনের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আমৃত্যু।

হাফেজ্জী হুজুরের ঘনিষ্ঠ কিছু সহযোগীদের মাঝেও যথার্থ বৈপ্লবিক চেতনা ছিল। তাঁদের সংখ্যা ছিল কম। বরং সঠিক চেতনাহীনদের সংখ্যাই ছিল বেশি। যার ফলে হাফেজ্জী হুজুরের অসতর্ক ও দুর্বল মুহূর্তগুলোতে আধিক্যের প্রভাবই প্রতিফলিত হতো।

তবে হাফেজ্জী হুজুরের আন্দোলনের সবচেয়ে সফলতার যে দিকটি, তা হলো এই কিংবদন্তী নেতা বিপ্লবপ্রত্যাশী অল্পসংখ্যক কর্মীর মাঝে হলেও বিপ্লবের সঠিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। যার ফলে তিনি যে বিপ্লব শুরু করেছিলেন, বিলম্বে হলেও এর সফলতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

যুগ পরিক্রমায় তাঁরই ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী ও একান্ত শিষ্য যথার্থ বৈপ্লবিক চেতনা বুকে ধারণ করে, ঐতিহ্যমণ্ডিত অতীত গৌরব অব্যাহত রেখে

আবারো ঘোষণা করেছেন এক বৈপ্লবিক আওয়াজ। এই মহাপুরুষও নিষ্ক্রিয় থাকেননি কোন দিন। দেশ-জাতি, ধর্ম ও সমাজের অধঃপতিত চিত্র দেখে গর্জে উঠেছেন তিনি। দীনে হকের অপূর্ণাঙ্গতা তিনি বরদাশ্ত করতে পারলেন না। তিনি গভীরভাবে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সকল সমস্যার উৎস চিহ্নিত করলেন। আর বিপ্লব স্পন্দিত বুকে আওয়াজ তুললেন ‘নীতির পরিবর্তন চাই’।

এ এক যুগান্তকারী আওয়াজ। এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক ঘোষণা। এ আওয়াজ হযরত হাফেজ্জী হুজুরের তওবার রাজনীতিরই চূড়ান্ত কর্মসূচি। এ আওয়াজে রয়েছে সৈয়দ আহমদ শহীদ রহ.-এর জিহাদের চেতনা। এ আওয়াজের ধারাক্রম শাহ আব্দুল আজীজ রহ.-এর ঐতিহাসিক ফতোয়ার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ আওয়াজে রয়েছে শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. স্বপ্ন। এ ভূখণ্ডকে এই বিপ্লবী আওয়াজ উচ্চারণ করেছেন, আজ আমাদের সেই মহাপুরুষকে চিনে নেওয়া উচিত।

কে এই মহাপুরুষ

যার কণ্ঠে নতুন করে উচ্চারিত হয়েছে নীতি পরিবর্তনের যুগান্তকারী আওয়াজ, তিনি হলেন ইসলামী বিপ্লবের আপসহীন রাহ্‌বার, এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করীম পীর সাহেব চরমোনাই রহ.। তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের। একটি ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে সর্বস্বীকৃত যেসব মৌলিক গুণাবলীর প্রয়োজন, এই বিপ্লবী নেতার মাঝে প্রায় সবগুলোরই সমাবেশ ঘটেছিল।

ইসলামী আন্দোলনের একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে প্রায় দেড় যুগ এই আদর্শ নেতার পাশে থেকে তাঁকে যথেষ্ট নিরীক্ষণের সুযোগ পেয়েছি। একজন বিপ্লবী পুরুষের মৌলিক গুণাবলীর উল্লেখযোগ্য কোন শূন্যতা তাঁর মাঝে খুঁজে পাইনি। সার্বক্ষণিকই মনে হয়েছে, তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবী নেতা। আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এতটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে, সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করীম নামের এই মহাপুরুষ অতি দ্রুত বলিষ্ঠ পদক্ষেপে একটি সর্বাঙ্গিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

নিরপেক্ষভাবে সেই সরল-সহজ ব্যক্তিটিকে কেউ বিশ্লেষণ করলে আমি হলফ করে বলতে পারি, মুঞ্চ না হয়ে পারবে না। তাঁর ব্যক্তিত্বে যে বিপ্লবের দুর্দমনীয় আকর্ষণ রয়েছে, যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন শুধু তারাই তা যথার্থভাবে বুঝতে পেরেছেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে দুর্বল কোন মন্তব্য করেছেন, এমন নজির এখনো চোখে পড়েনি। রাজনৈতিক কারণে যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ওপর আঘাত করার যৌক্তিকতা কখনো কেউ প্রকাশ করতে পারেনি।

যেহেতু হাদীসে এসেছে—

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থ : যে মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, সে তার যুগের ইমামকে চিনল না, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।

অতএব কোন মামুলি ব্যক্তির অমূলক প্রশংসা নয়, বরং এক মহাপুরুষের যথার্থ পরিচয় তুলে ধরে যুগের ইমামকে জাতির সামনে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ববোধ থেকেই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। তবে একথা অকপটে স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই যে, আমাদের মত নগণ্যদের পক্ষে এই মহান ব্যক্তির নতুন করে পরিচয় তুলে ধরার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁকে প্রচার করার মুখাপেক্ষীও তিনি নন। আত্মপ্রচারের মানসিকতা তাঁর মধ্যে কোনদিন দেখতে পাইনি। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে যতটুকু উপলব্ধি করেছি, তাতে মনে হয়েছে, যারা এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে চান, তাদেরকে এই আকর্ষণীয় ব্যক্তিটি সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা রাখা উচিত।

যারা ইসলামকে ভালবাসেন, ইসলামী অঙ্গনের এই ব্যক্তিটিকে একটু যথার্থভাবে চিনে নিলে তারা অতি সহজেই একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যারা তাঁর বিরোধিতা করেন, সমালোচনা করেন, তাদেরও উচিত তাঁর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা। যাতে বিরোধিতা ও সমালোচনার পেছনে কোন যথার্থ যুক্তি পেশ করতে পারেন।

এই মহাপুরুষের পরিচয় তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে না পারার সবচেয়ে বড় যে কারণ, তা হলো, আমরা যারা হযরত হাফেজ্জী হুজুরের আন্দোলনের ক্ষুদ্রে কর্মী হিসেবে এ দেশে একটি ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলাম, তারা খেলাফতের বিপর্যয়ের পর একজন যথার্থ বিপ্লবী নেতার তলাশ করছিলাম। ইসলামী বিপ্লবের চেতনা যেদিন দেমাগে প্রবেশ করেছে, সেদিন থেকেই একজন সক্ষম আদর্শ বিপ্লবী নেতাকে হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছিলাম। যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের সফলতা-ব্যর্থতা এবং আদর্শিক বিপ্লবের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তায় যতটুকু উপলব্ধি

হয়েছি, তাতে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে বাধ্য হয়েছি যে, একজন আপসহীন আদর্শ বিপ্লবী নেতা ছাড়া পৃথিবীর কোন প্রান্তেই কোন আদর্শিক বিপ্লব সম্ভব নয়। অতএব একজন বিপ্লবী নেতা ছাড়া আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে বিপ্লবের কল্পনাও করা যায় না।

তাই আমরা যখন যথার্থ বিপ্লবী নেতাকে খুঁজে পেলাম, তখন যারা এ দেশের একটি ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে এবং একটি বিপ্লবী কাফেলার সহযোদ্ধা হতে চায়, তাদের সামনে এই বিপ্লবী নেতাকে তুলে ধরার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম।

কাউকে যদি এই নেতার চরিত্র, আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব আকৃষ্ট করতে সক্ষম নাও হয়, তবুও তাঁকে একটু ভাল করে জানতে এবং তাঁর মিশন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে তো কোন ক্ষতি নেই। আর তিনি এমনি এক সহজ-সরল ব্যক্তি, যার সম্পর্কে জানা ও বোঝা, তাঁর বিপ্লবী মিশনের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ করা কারো পক্ষে কোন কঠিন বিষয় নয়।

তিনি দেখতে আহামরি কিছু নন, কিন্তু তাঁকে একবার দেখলে বার বার দেখতে মন চায়। একবার তাঁর মুখোমুখি হলে, চেহারার দিকে চেয়ে থাকতে মন চায়। কাছে বসতে মন চায়। তিনি যে মজলিসেই উপস্থিত হন, পরিস্থিতি তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তিনি যা বলেন, তাই করেন। তিনি যখন কথা বলেন, তখন সবাই সমানভাবে তা বুঝতে পারে। তিনি সকল শ্রেণির জন্যে উপযোগী আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনায় কখনো বাহুল্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি যখন মধ্যে বক্তৃতা করেন, তখন আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে কথা বলেন না। নীতির প্রশ্নে তিনি অটল। চুক্তির ক্ষেত্রে দৃঢ় আর সমঝোতার ক্ষেত্রে সহনশীল। তিনি হতাশ হন না কখনো। আবার আবেগও তাঁকে ভারসাম্যহীন করতে পারে না।

শরীয়তের প্রয়োজনীয় ইলম তাঁর আছে, কিন্তু তাকে কখনো পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে দেখা যায় না। তিনি উস্তাদদের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু নীতির প্রশ্নে তিনি কাউকে সমীহ করেন না। ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রতি তিনি যেমন কঠোর, স্বাধীনতা বিদ্বেষী ও দেশদ্রোহীদের প্রতিও

তিনি তেমন কঠিন। তিনি দীন ও ইসলাম নিয়েও ফিকির করেন, আবার দেশ-জাতি নিয়েও ফিকির করেন। সবার কথা তিনি মনযোগ দিয়ে শোনেন। সবরকম সমস্যার কথা তাঁর কাছে বলা যায়। তিনি সব শুনে এবং আন্তরিকতার সাথে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন।

তিনি একজন পীর, কিন্তু খানকায় বসে থাকেন না। বলতে গেলে তাঁর নির্দিষ্ট কোন খানকাই নেই। দেশের শীর্ষস্থানীয় একজন পীর হওয়ায় তিনি মোটেও গর্বের বিষয় মনে করেন না। তিনি পাঁচ টাকা হাদিয়া গ্রহণ করেন কিন্তু কোটিপতিদের প্রতি তাঁর বিশেষ কোন আকর্ষণ প্রকাশ পায় না। তিনি ইসলামের সকল খেদমতকে ভালবাসেন, তবে ইসলামের অপূর্ণাঙ্গতাকে মেনে নিতে পারেন না।

তিনি তার সংসারের প্রতি উদাসীন নন। ছেলে-মেয়েদেরকে প্রয়োজনীয় সাহচর্য দেওয়ার চেষ্টা করেন। সুযোগ পেলে সংসারের কাজ করেন, রাজপথের মিছিলে নেতৃত্ব দেন। ইসলামী আন্দোলনে নিয়মিত চাঁদা দেন। নিয়মিত পত্র-পত্রিকা পড়েন। মহাপুরুষদের বই পাঠ করেন। আন্দোলনের কর্মীদের তা'লীম-তারবিয়াত দেন। পরামর্শ ছাড়া এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। তাঁর প্রতি কর্মীবাহিনীর নজিরবিহীন আনুগত্য সত্ত্বেও তিনি কারো প্রতি কিছু চাপিয়ে দেন না। তিনি সময়ের প্রতি খুবই সজাগ। তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন। প্রত্যেকটা মুহূর্ত তিনি কাজে অতিবাহিত করেন। তিনি সমাজ সচেতন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়েও তিনি অসতর্ক নন।

এক সময় তিনি ব্যবসা করেছেন। হাদীসের দরসও দিয়েছেন। তিনি মাদ্রাসায় পড়েছেন। আলিয়াতেও পড়েছেন, কওমীতেও পড়েছেন। হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. তাঁকে খেলাফত দান করেছেন। তিনি খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমীর ছিলেন।

তিনি চিশ্টিয়া ছাবেরিয়া তরীকার এ দেশের সর্ববৃহৎ ধারা, বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটির আমীরুল মুজাহিদীন। তাঁর আন্দোলনের যেমন রয়েছে বিশাল কর্মীবাহিনী, তেমনি তাঁর তরীকারও রয়েছে লাখ লাখ অনুসারী। দিন দিন তাঁর অনুসারী ও কর্মীর সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একবার যারা তাঁর মিশনে শরীক হন, তারা আর কখনও ফিরে যান না।

তার অনুসারীদের বেশির ভাগই দরিদ্র। মেহনতি মানুষই তাঁর আনুগত্য করে বেশি। যাদের স্বার্থে আঘাত লাগে, তারাই তাঁর বিরোধিতা করে।

সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা সৈয়দ এছহাক রহ. ছিলেন একজন স্বনামধন্য আধ্যাত্মিক পীর। সৈয়দ এছহাক রহ.-ই বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন।

এই হল চরমোনাইর হযরত পীর সাহেব রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়—যিনি গোটা দেশে নীতি পরিবর্তনের আওয়াজ তুলেছিলেন। তিনি কেন ঘোষণা দিয়েছিলেন নীতির পরিবর্তনের, তা আজ আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত।

কেন এই নীতি পরিবর্তনের ডাক

পীর সাহেব চরমোনাই দেশের এই প্রেক্ষাপটে কেন নীতি পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন, নীতি পরিবর্তনের সাথে ইসলামী আন্দোলনের কী সম্পর্ক? পীর সাহেব চরমোনাই নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান?

এসব প্রশ্নের সহজ উত্তর পীর সাহেব নিজেই দিয়েছেন। নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা এবং এই সার্বজনীন দাবির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তিনি বলেছেন— মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টি করেছেন, তাই কোন নীতিতে মানুষ পরিচালিত হলে প্রকৃত শান্তি পাবে, তা একমাত্র আল্লাহই ভালো বোঝেন।

অতএব আল্লাহর দেওয়া নীতি ছাড়া মানুষ যে নীতিই গ্রহণ করুক, দুনিয়াতে কিছুতেই শান্তি পাবে না। আর এ পৃথিবীও আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্ব পরিচালনার জন্যে আল্লাহ একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিও দিয়েছেন। অতএব বিশ্বের যেখানেই আল্লাহর দেওয়া নীতি অনুসরণ হবে না, সেখানেই অশান্তি সৃষ্টি হবে।

আমাদের দেশের মানুষ যেহেতু আল্লাহর দেওয়া নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে না, রাষ্ট্রও পরিচালিত হচ্ছে না আল্লাহর দেওয়া নীতি অনুযায়ী, বরং এখানে চলছে মানুষের মনগড়া নীতি। রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে শয়তান ও তাগুতের নীতি। অতএব এ নীতির পরিবর্তন না ঘটানো পর্যন্ত এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। মানুষ প্রকৃত মুক্তি পেতে পারে না। এই মৌলিক চেতনাকে সামনে রেখেই পীর সাহেব চরমোনাই নীতি পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি একথা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, নীতি পরিবর্তনের চেতনা ছাড়া খোদাদ্রোহী শাসনব্যবস্থা ও জাহেলী সমাজব্যবস্থার পতনের কোন পথ নেই।

নীতি পরিবর্তনের যৌক্তিক দাবিকে সামনে রেখে পীর সাহেব চরমোনাই জনগণের সামনে যেসব বাস্তব সত্য তুলে ধরেছেন, তা অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। কারণ এ জাতি শান্তির আশায় বহু কিছুই পরিবর্তন ঘটিয়েছে। পরিবর্তনের প্রতিটি প্রেক্ষাপটে এ জাতি বহু রক্ত দিয়েছে। অসংখ্য মানুষ জীবন দিয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, লাঞ্চিত হয়েছে, অনেকবার সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে। ভাগ্যাহত এ জাতির ত্যাগের বিনিময়ে ভূখন্ড পরিবর্তন হয়েছে। ভাষার পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার পরিবর্তন হয়েছে। রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয়েছে। পতাকার পরিবর্তন হয়েছে। পরিশেষে চার দশক ধরে চলছে নেতা পরিবর্তনের বীভৎস মহড়া।

শান্তির আশায় এ দেশের শান্তিকামী মানুষ জীবনের বিনিময়ে একের পর এক নেতার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। শান্তির আশায় এক নেতাকে সরিয়ে আরেক নেতাকে বসিয়েছে। কিন্তু শান্তি আসেনি। বরং অশান্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

শুধু নেতার পরিবর্তনেই যে শান্তি আসতে পারে না, তা বহুবার প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু নেতা পরিবর্তনের প্রবণতা এ জাতির চরিত্র থেকে এখনো দূর হয়নি। জাতির কলুষিত চেতনা থেকে এই অশুভ প্রবণতাকে দূর করার জন্যই পীর সাহেব চরমোনাই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন— ‘শান্তি পেতে হলে শুধু নেতা নয়, নীতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে।’ শুধু নেতার পরিবর্তন আর ক্ষমতার হাত বদলের দ্বারা যে শান্তি আসতে পারে না, বিগত দিনের বাংলাদেশের ইতিহাস থেকেই আমরা বহুবার তা প্রমাণ পেয়েছি।

মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান একজন বড় মাপের নেতা ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অবদান ও কৃতিত্বের কথা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু দেশ শাসন করে তিনি মোটেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। অতএব শান্তির আশায় তাঁকে পরিবর্তন করা হল। ক্ষমতায় বসানো হল মরহুম জিয়াউর রহমানকে। তাঁকেও দেশের মানুষ একজন বিজ্ঞ নেতা হিসেবেই জানে। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানও কম নয়। তিনি একজন জনপ্রিয় সেনাপ্রধানও ছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় বসে তিনিও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। অতএব তাঁকেও

শান্তির আশায় জনগণই আবার ক্ষমতায় বসাল বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে। একজন বিচারপতি হিসেবে তাঁকে কোন অংশে ছোট নেতা বলা যায় না। কিন্তু তিনিও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেন না। অতএব স্বাভাবিক কারণে ক্ষমতায়ও থাকতে পারলেন না। তাঁকে পরিবর্তন করা হল। তারপর শান্তির বার্তা নিয়ে এলেন পরাক্রমশালী এরশাদ। অশান্তির মাধ্যমেই শুরু করলেন দেশ শাসন। গোটা জাতিকে অশান্ত করে নয় বছর দেশ শাসন করলেন। অতঃপর সবাই মিলে বহু কষ্টে তাঁকে পরিবর্তন করল। আবারো শান্তির আশায় বুক বাঁধল জনতা। এবার শান্তির দেবী হিসেবে ক্ষমতায় বসাল মরহুম জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই সে আশাও আর পূরণ হল না। আবারো পরিবর্তনের আওয়াজ উঠল। সবাই মিলে পরিবর্তন করল বেগম জিয়াকেও।

বহু আকুতি-মিনতি করে এবার ক্ষমতায় এলেন শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা। বাবা এতো বড় নেতা হয়ে যেখানে দেশ ও জাতিকে বিন্দুমাত্র শান্তির পরশ দিতে পারেননি, সেখানে পরাশ্রয়ী দুর্বল কন্যা বিক্ষুব্ধ জাতিকে শান্তি দিতে পারবে, দেশে শান্তির সুবাস প্রবাহিত করতে পারবে, একথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে পৃথিবীতে অবাস্তব বলে কিছু থাকবে না। বরং একথা আল্লাহর নামে শপথ করে বলা যায়, শান্তি প্রতিষ্ঠার সাধ্য তারও নেই, যে কারণে তাকেও পরিবর্তন হতে হয়েছে জনরোষের ফলাফল হাতে নিয়ে। এভাবে একের পর এক সরকার পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

অতএব শুধু নেতার পরিবর্তনের মাধ্যমে যে শান্তি আসতে পারে না, এটা বুঝতে আর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। এ কারণেই এ ভূখণ্ডে আজও শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি। বৃটিশ শাসনামল থেকে এ পর্যন্ত শান্তির আশায় শুধু নেতা-নেত্রীরই পরিবর্তন হয়েছে, নীতির কোন হেরফের হয়নি। রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক উপাদান হিসেবে সবাই একই নীতি গ্রহণ করেছে। সময়ে সময়ে শুধু নিজেদের স্বার্থে অথবা বাহবা কুড়ানোর জন্যে বৃটিশদের রেখে যাওয়া নীতির সাথে কিছুটা রঙ লাগানো হয়েছে। আল্লাহ্‌প্রদত্ত মানবসভ্যতার উপযোগী নীতিকে কেউ গ্রহণ করেনি। আল্লাহ্‌র দেওয়া নীতিতে দেশ

পাকিস্তান সৃষ্টির পরও যখন পাকিস্তানী শাসকরা মানবরচিত নিকৃষ্ট নীতির আশ্রয় নিয়েছে, অবজ্ঞা করেছে আল্লাহর পবিত্র নীতির, তখন থেকেই শুরু হয়েছে বিপর্যয়ের নতুন ধারা। সেই বিপর্যয়ের অধ্যায় এখনো অব্যাহত রয়েছে। এখনো শেষ হয়নি অশান্তির বিভীষিকা, বরং বর্তমান প্রেক্ষাপট এক চরম অধঃপতন ও ভয়ংকর বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সচেতন মানুষ কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারছে যে, শুধু নেতা-নেত্রী বদল, আর ক্ষমতার হাত বদলের পুরাতন আবর্তে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে না। কিন্তু তারপরও সঠিক চেতনায় এখনো জেগে উঠছে না বিবেকবানরা। শান্তির মোহে নেতা পরিবর্তন আর ক্ষমতার হাত বদলের আকাঙ্ক্ষার প্রবণতা দূর হয়নি আজও।

জাতির এই অচৈতন্য ও পশ্চাদপদ মানসিকতার অশুভ পরিণতি লক্ষ্য করেই পীর সাহেব চরমোনাই নীতির পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন। তিনি স্পষ্টই ঘোষণা দিয়েছেন, বর্তমান মানবরচিত কুফরী সংবিধানকে বহাল রেখে কিয়ামত পর্যন্তও যদি ক্ষমতার হাত বদল হতে থাকে, আর নেতার পরিবর্তন ঘটতে থাকে, তারপরও কিছুতেই শান্তির আশা করা যাবে না। তাই মানবতার মুক্তির জন্যে প্রকৃত শান্তি পেতে হলে বর্তমান মানবরচিত কুফরী নীতির পরিবর্তন করে আল্লাহপ্রদত্ত ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই।

নীতির পরিবর্তনের আওয়াজ গণ-ঐক্যের ভিত্তি

একটি সফল গণ-বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজন ব্যাপকভিত্তিক গণ-ঐক্য। একক কোন ইসলামী দলের পক্ষে বর্তমান প্রেক্ষাপটে গণ-ঐক্য সৃষ্টির সম্ভাবনা ক্ষীণ। দলীয় রাজনীতির গন্ডিতে থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ও ত্যাগী কর্মীবাহিনী দিয়ে হয়তো কেউ সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তা করতে পারেন। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত গণ-ঐক্যের মাধ্যমে একটি সফল গণ-বিপ্লব সম্ভব নয়। আর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনতার সমর্থন নিয়ে গণ-বিপ্লবের কথা না ভেবে সরাসরি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা একটি কঠিন বাস্তবতা।

অবশ্য গণ-বিপ্লব এক পর্যায়ে প্রতিরোধ ও নির্যাতনের মুখে সশস্ত্র বিপ্লবে পরিণত হতে পারে। আর সেই কঠিন মুহূর্তে যেন বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে না যায় সে জন্যেই প্রয়োজন হয় পরীক্ষিত, দক্ষ ও ত্যাগী কর্মীবাহিনী। কর্মীদের সামগ্রিক মানের ওপর নির্ভর করে সফল বিপ্লবের সম্ভাব্যতা। বলিষ্ঠ কর্মীবাহিনীর দৃঢ়তা ও সাহসিকতাই জনতাকে আকৃষ্ট করে বিপ্লবের প্রতি।

অতএব, একজন বিপ্লবী নেতার জন্যে এমন একটি প্রক্রিয়া গড়ে তোলা প্রয়োজন, যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পর্যাপ্ত রক্ত ও জীবন দেওয়ার মত একটি যোগ্য কর্মীবাহিনী গড়ে উঠতে পারে। এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই পীর সাহেব চরমোনাই রহ. গড়ে তুলেছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন।

যেহেতু দলীয় রাজনীতি দিয়ে একটি সফল ইসলামী গণ-বিপ্লব সম্ভব নয়, তাই পীর সাহেব তার প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন সম্পর্কে স্পষ্টই

কর্মী গঠনের জন্যে এ আন্দোলনে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে, তা কোন দলীয় সংকীর্ণতার আলোকে নয়; বরং একটি ব্যাপকভিত্তিক গণ-বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার আলোকে। ইস্যুভিত্তিক গণ-আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের জন্যে আমাদের দেশ একটি উর্বর ভূমি। ইস্যুভিত্তিক গণ-আন্দোলনের সফলতা এদেশে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। অতএব এদেশে একটি আদর্শভিত্তিক গণ-বিপ্লবের চিন্তা করাই হল সঠিক বাস্তবতা। ইস্যুভিত্তিক গণ-আন্দোলন আর আদর্শিক গণ-বিপ্লবের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান থাকলেও দুটোরই অন্যতম প্রধান উপাদান হল গণ-ঐক্য।

গণ-আন্দোলন যেমন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সমর্থন ছাড়া সফল হতে পারে না, তেমনি একটি আদর্শিক বিপ্লবের জন্যেও প্রয়োজন একটি বৃহৎ শ্রেণির সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সচেতন শ্রেণীর নৈতিক সমর্থন। এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করেই বিচক্ষণ বিপ্লবী রাহবার পীর সাহেব চরমোনাই এমন একটি বিপ্লবী আওয়াজ উচ্চারণ করেছিলেন, যেন একে কেন্দ্র করে অতি সহজেই একটি গণ-ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে।

তবে একথাও বাস্তব, ইসলামী বিপ্লবের সফলতা সংখ্যাধিক্যের শক্তি ও মতামতের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং স্বল্পসংখ্যক দুর্বল জামাআতকেও মহান রাব্বুল আলামীন শক্তিদ্বারা বিশাল বাহিনীর ওপর তাঁর কুদরতের মাধ্যমে বিজয় দান করেন। ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই একজন মুমিন মুসলমানের দায়িত্ব হল, গোটা দুনিয়াও যদি বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তারপরও দীনে হককে বিজয়ী করার জন্যে আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

সফলতা আর বিফলতার চূড়ান্ত এখতিয়ার আল্লাহর হাতে। কিন্তু বাস্তব অবস্থার আলোকে ইসলামী বিপ্লবের কৌশল নির্ধারণের দায়িত্ব দীনের রাহবারগণ কিছুতেই এড়াতে পারেন না। তবে বিপ্লবের কৌশল অবশ্যই রাসূলুলাহ স. অনুসৃত কৌশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। নয়তো দীনকে বিজয়ী করার বিপ্লব করতে গিয়ে বদদীনী ফেতনায় জড়িয়ে পরার আশংকা প্রবল।

রাসূলুল্লাহ স. তাঁর বিপ্লবী জীবনে দীনে হককে বিজয়ী করার জন্যে দু'ধরনের কৌশলই অবলম্বন করেছেন। তিনি খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবও করেছেন, আবার গণ-বিপ্লবও করেছেন। বদর প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ (স.) কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করেছেন। আবার গণ-বিপ্লবের মাধ্যমে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেছেন। বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ স. এক দুর্বল বাহিনী ও মামুলি অস্ত্র নিয়ে মোকাবেলা করেছেন এক শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর। আর মক্কা বিজয়ের সময় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই ছিল রাসূলুল্লাহ স.-এর পক্ষে। মক্কায যারা কাফেরদের ভয়ে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি, মক্কার জনগণের এমন একটি বৃহৎ শ্রেণির নৈতিক সমর্থন ছিল মক্কা বিজয়ের ক্ষেত্রে। যার ফলে খোদাদ্রোহী কাফেরদের ক্ষমতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তারা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বিপ্লবী বাহিনীকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। আবু সুফিয়ানের মত শীর্ষ নেতারা পর্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর বিপ্লবী জীবনের প্রথম ধাপ হল মদিনা বিজয়। একটি সফল অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মদিনা বিজয়ের প্রতিক্রিয়াই হলো বদরের সশস্ত্র বিপ্লব। এই সশস্ত্র বিপ্লবের সফলতার মধ্য দিয়ে গণ-বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। আর এরই চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে। রাসূলুল্লাহ স.-এর বিপ্লবের কৌশলকে সামনে রেখেই পীর সাহেব চরমোনাই এদেশে একটি গণ-বিপ্লবের চিন্তা করেছেন।

যেহেতু এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ইসলামপ্রিয়। অধিকাংশ মানুষের অন্তরেই ইসলামী আদর্শের প্রতি ভালবাসা আছে। কিন্তু সর্বত্র ইসলামী আদর্শের যথাযথ প্রতিফলন ঘটছে না খোদাদ্রোহীদের দোদাঁড় প্রতাপের কারণে। এ পরিস্থিতিতে পীর সাহেব চরমোনাই দীন প্রতিষ্ঠার জন্যে রাসূলুল্লাহ স.-এর গণ-বিপ্লবের কৌশলকেই এদেশের প্রেক্ষাপটে উপযোগী মনে করেছেন।

এই গণ-বিপ্লবের চিন্তাকে সামনে রেখেই পীর সাহেব চরমোনাই এমন এক আওয়াজ উচ্চারণ করেছেন, যা বৃহত্তর গণ-ঐক্যের ভিত্তি রচনা করতে পারে। যারা আজ এদেশের বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্ব

যারা বিভিন্ন মহৎ দীনি খেদমতে জড়িত আছেন এবং যারা এদেশে ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে দেখতে চান, তাদেরকে চরমোনাইর হযরত পীর সাহেবের এই আহ্বানকে সচেতন ও নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করে দেখা উচিত।

একথা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই যে, এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অন্যতম অন্তরায় হল ইসলামের নামে বিভিন্ন সংগঠন ও দলের অস্তিত্ব এবং তাদের মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত অনৈক্য।

সর্বোপরি অসংখ্য দীনি খেদমতের মধ্যে পারস্পরিক সুসমন্বয়ের অভাব দীন প্রতিষ্ঠার গতিকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। এই বাস্তব সমস্যাকে সামনে রেখেই পীর সাহেব চরমোনাই এমন একটি আওয়াজ তুলেছেন, যাকে কেন্দ্র করে সকল শ্রেণির সকল দল ও মতের ইসলামপ্রিয় জনতা এবং শান্তিকামী মানুষ গণ-ঐক্য গড়ে তুলতে পারেন। এই আওয়াজকে কেন্দ্র করে দীনি মিশনগুলোর মাঝেও সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে উঠতে পারে।

পীর সাহেব চরমোনাই সকল দল-মতের দীনদার ও শান্তিকামী মানুষকে পরিষ্কারভাবে নীতির পরিবর্তনের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন— “নেতা কে হবেন, দেশ কারা পরিচালনা করবেন, তা নীতির আলোকে জনগণই নির্ধারণ করবে। কিন্তু তার আগে যে নীতি মানবতার মুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে, যে নীতি সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অক্ষম, যে নীতি সর্বত্র আল্লাহ্র নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, আসুন ঐক্যবদ্ধভাবে সেই নীতির পরিবর্তন ঘটাই।”

নীতির পরিবর্তনের এই ঘোষণা একটি আদর্শিক বিপ্লবের আওয়াজ হলেও ইস্যুভিত্তিক গণ-আন্দোলনের মত সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এতে সহজেই সর্বাঙ্গিকভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে। তাই অগ্রসর দীনদার শ্রেণি এবং সচেতন উলামায়ে কেরাম যদি চরমোনাইর হযরত পীর সাহেবের নীতির পরিবর্তনের এই আওয়াজকে যথাধর্ম বলে উপলব্ধি করে থাকেন, তাহলে শুধু নৈতিক সমর্থনের মাধ্যমেই এর সফলতা অর্জিত হবে না। বরং দীনকে বিজয়ী করার গুরু দায়িত্বের কথা চিন্তা করে নীতির পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে একটি

তোলার কথা একান্তভাবে ভেবে দেখা উচিত। বিভক্ত ইসলামী দলগুলোকে একীভূত করার জটিল প্রক্রিয়ার চেয়ে পীর সাহেবের এই আওয়াজকে কেন্দ্র করে এই একটি মাত্র আদর্শিক ইস্যুতে গণ-ঐক্য গড়ে তোলা সবচেয়ে সহজ ও বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়া। তাছাড়া নীতির পরিবর্তনের এই বিপ্লবী আওয়াজকে কেন্দ্র করে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার মাধ্যমে অতি দ্রুত একটি গণ-বিপ্লব সৃষ্টি করা সম্ভব। কারণ নীতির পরিবর্তনের সরল ব্যাখ্যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষই অতি সহজে বুঝতে সক্ষম। আর দুর্বোধ্য কোন জটিল প্রক্রিয়ায় গণ-মানুষের মাঝে গণ-জাগরণ সৃষ্টি করা খুবই জটিল। এই বাস্তব চিন্তার প্রতিফলন না হওয়াতেই দেখা গেছে কেউ কেউ যুগের পর যুগ এমনকি অর্ধ শতাব্দী ধরে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে আন্দোলন চালিয়েও গণ-জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। এমনকি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কঠোর সাংগঠনিক তৎপরতাও কথিত সম্ভাবনার মুহূর্তে আবারো ক্ষয়িষ্ণু ধারায় পিছিয়ে যাচ্ছে।

তবে একথা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই, একটি গণ-বিপ্লবের সফল পরিণতির জন্যে সুষ্ঠু সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও গতিশীল নিয়মতান্ত্রিক তৎপরতা অপরিহার্য। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ছাড়া যেমন গণ-বিপ্লব সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, তেমনি বিপ্লবের সফলতাও ধরে রাখা যায় না। এসব বাস্তব দিক চিন্তা করেই নীতির পরিবর্তনের প্রবক্তা পীর সাহেব চরমোনাই (রহ.) একটি গতিশীল সাংগঠনিক প্রক্রিয়ারও নেতৃত্ব দিয়েছেন। অতএব যারা এদেশে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিপ্লব কামনা করেন, নীতির পরিবর্তনের এই বিপ্লবী আওয়াজকে সমর্থন করতে তাদের পক্ষে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা থাকার কথা নয়।

খোদাদ্রোহী শাসনব্যবস্থার যাঁতাকলে ইসলামী চেতনা যখন প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত হচ্ছে, ইসলামপন্থী জনতা যখন একটি চরম প্রতিকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, তখন সচেতন বিবেকবানদের নির্বিকার বসে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে দায়িত্ববানদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আর দীন ইসলামকে বিজয়ী করার ন্যূনতম দায়িত্ববোধ যাদের আছে, তাদেরও নতুন করে চিন্তা করা উচিত।

সর্বস্তরের ইসলামী সংগঠন ও আন্দোলনের কর্মীদেরকে ভেবে দেখা উচিত, একজন বিপ্লবী নেতার নীতির পরিবর্তনের ঘোষণাকে যথার্থভাবে কাজে লাগিয়ে একটি সর্বাঙ্গিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়া যায় কিনা।

ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেকটি কর্মীকে একথা মনে রাখতে হবে, যুগের একজন বিপ্লবী নেতা একটি জাতির জন্যে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু ত্যাগী ও বিপ্লবী কর্মীবাহিনী না হলে একজন আদর্শ বিপ্লবী নেতার পক্ষেও কিছুতেই একটি সফল বিপ্লব সম্ভব নয়। এর বাস্তব নজির আমরা অসংখ্য আফ্রিয়ায় কেরামের জীবনীতে খুঁজে পাই। যে নবীগণ পর্যাপ্ত ত্যাগী ও বিপ্লবী অনুসারী তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের যুগেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দীনকে পূর্ণাঙ্গভাবে বিজয়ী করেছেন। কিন্তু যাদের যুগে ত্যাগী ও বিপ্লবী অনুসারী সৃষ্টি হয়নি, সে যুগের আফ্রিয়াগণ যথার্থভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও দীন পূর্ণাঙ্গভাবে বিজয়ী হয়নি।

অতএব দীনকে বিজয়ী করার জন্যে যেমন বিপ্লবের প্রয়োজন, একটি সফল বিপ্লবের জন্যে একজন আদর্শ বিপ্লবী নেতা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন একটি সুশৃঙ্খল, ত্যাগী, জানবাজ বিপ্লবী কর্মীবাহিনী। তাই আজ নীতির পরিবর্তনের বিপ্লবী আওয়াজকে কেন্দ্র করে একটি সর্বাঙ্গিক গণ-বিপ্লব ঘটাতে হলে, এ আওয়াজের প্রতিধ্বনি পৌঁছে দিতে হবে গণ-মানুষের কানে কানে। সাথে সাথে একটি সর্বাঙ্গিক গণ-বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্বের জন্যে সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে কাক্ষিত সেই প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফীক দান করুন। আমীন।



ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন
সম্পর্কে জানতে হলে
পড়ুন

পরিচিতি

কর্মকৌশল

নীতিমালা

এসো মুক্তির রাজপথে

এসো মুক্তির মোহনায়

কালিমায়ে তায়্যিবার দাবি

আল্লাহর পথে সংগ্রাম

পাঁচদফা কর্মসূচির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ

আমাদের লক্ষ্য ও পথ চলার নীতি

প্রকাশনায়

আই.এস.সি.এ পাবলিকেশন্স

৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা)

ঢাকা-১০০০

ফোন: ৯৫৬৭১৩০